সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
Influential Factors of Social Life

ইউনিট ৬

পরিবর্তনশীল মানব সমাজে নানা রকম উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত ভাবনা ও বংশগতির প্রভাব অন্যতম। এসব উপাদান কখনো এককভাবে আবার কখনো অন্য উপাদানের সহযোগী হয়ে সমাজ পরিবর্তনে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। কেননা এসব উপাদানসমূহ একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানুষের খাপ খাওয়াতে সাময়িক অসুবিধা হলেও অবশেষে তা পারে। শুধু সমাজজীবন নয়, মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। যদিও মানুষ পরিবেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে তথাপি কখনো কখনো পরিবেশ দ্বারাও মানুষের জীবনযাত্র বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজজীবনে মানুষের সব রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, নিয়ম-শৃঙখলা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জীবনাচরণ ইত্যাদি সব কিছুই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নদী ভাঙ্গনের ফলে মানুষের সামাজিক জীবন বিপন্ন হয়, মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসতি গড়তে বাধ্য হয়। আবার আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান সময়ে সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৬.১: সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
পাঠ- ৬.২: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
পাঠ- ৬.৩: সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব
পাঠ- ৬.৪: সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

পাঠ-৬.১ সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
Impact of Geographical Environment on Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ, জলবায়ু, অঞ্চল, অস্তিত্ব, প্রভাব ইত্যাদি।

ভৌগোলিক পরিবেশ হলো ভূ- প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটির উর্বরতা, সমতল ভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী নিবিড় অরণ্য এবং মরুভূমির সামগ্রিক অস্তিত্ব। প্রাকৃতিক পরিবেশই সাধারণত নানাবিধ ভৌগোলিক উপাদানের মাধ্যমে গঠিত। সব ভৌগোলিক উপাদানের বৈচিত্র্যের কারণেই পৃথিবীর নানান দেশের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি পরিলিক্ষিত হয়। ভৌগোলিক উপাদান এমনই শক্তিশালী যে, এর ভিত্তিতে সমাজচিন্তাবিদরা সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি বিকাশ ও বিলুপ্তির পেছনে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালের সমাজ দার্শনিকরা সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাবকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

ভৌগোলিক মতবাদে গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরিস্টটলের মতে, অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে প্রাচীনকালে গ্রীকরা নানাক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছেন। ব্যাকন ও হান্টিংটন মানব সমাজে ভৌগোলিক প্রভাবের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন এবং যা ভৌগোলিক যা নিয়ন্ত্রণবাদ নামে পরিচিত।

মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ হান্টিংটন দেখিয়েছেন যে, জলবায়ু মানুষের কর্মকান্ডকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে, অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবেই উত্তর অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ব্যাকন বলতে চেয়েছেন, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে ও বিকশিত হয়। ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু বলেছেন মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা চেতনা, পরিকল্পনা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ দৈহিকভাবে শক্তিশালী ও সাহসী হয়ে থাকে। আবার উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলের মানুষ ঠিক তার বিপরীত কর্ম বিমুখ ও অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভৌগোলিক উপাদানের ভিন্নতার কারণেই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে ও অগ্রগতির মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে সত্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রকৃতির কাছে আজও অসহায়। সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে। মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানব বসতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ২০১৫ সালে নেপালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। পূর্বাভাস ও সাধারণ সর্তকতার মাধ্যমে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো ছাড়া প্রকৃতির খেয়ালীপনা সর্বদাই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গেছে।

বস্তুতপক্ষে, মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে মানুষ কোনো ক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১) প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং ২) পরোক্ষ প্রভাব

প্রত্যক্ষ প্রভাব

১) সভ্যতার বিকাশ: এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী গোল্ডেন ওয়েজার বলেন, মানুষ কী ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলবে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার রূপরেখা প্রদান করে, যেমন মরু প্রদেশ এবং উষ্ণ মন্ডলের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব জীবনযাত্রাও যে সেসব অঞ্চলে ভিন্ন হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। উষ্ণ মন্ডলের লোকদের পক্ষে এস্কিমোদের মত

তুষার ঘর তৈরী করা সম্ভব নয়, আবার ইন্দোনেশিয়াতে উষ্ণমন্ডলজনিত কারণে দেখা যায় নারিকেল গাছ বেশি জন্মে। তাই এই নারিকেলের উপর ভিত্তি করে সেখানে গড়ে উঠেছে নারিকেল সংস্কৃতি । কিন্তু এস্কিমোরা ইচ্ছে করলেই নারিকেল সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে না। অন্যদিকে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হবার ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে ধ্রুপদী সভ্যতা।

২) কর্ম প্রতিভার বিকাশ: অনেক সময় অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাই কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, "ভৌগোলিক পরিবেশের সুতিকাগারই মানুষের কর্ম প্রতিভার বিকাশের সর্বোত্তম ক্ষেত্র।" কারণ এখানেই মানুষ আপন ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করার সুযোগ পায়।

৩) শিল্পের উপর প্রভাব: বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে তথা মাটি, জলবায়ু ও তাপমাত্রার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। যেমন:বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বিধায় সেখানে চা-শিল্প গড়ে উঠেছে। একইভাবে সিলেটে কমলা উৎপন্ন হয়, বরিশালে বিপুল পরিমাণ ধান জন্মে, রাজশাহী ও কুষ্টিয়ায় অনেক আম পাওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ও তীব্রতর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে এবং তা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে।

৪) পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন স্থানে নানা পেশার লোক দেখা যায়। যেমন-যেখানে খনি আছে সেখানে খনিশ্রমিক, শিল্প এলাকায় শিল্প শ্রমিক এবং কৃষি প্রধান এলাকায় কৃষিশ্রমিক বেশি দেখা যায়।

৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব: ভৌগোলিক বৈচিত্র্য একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে । এক মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশের এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। যেমন- খাইবার গিরিপথ ও সুয়েজখাল পাশ্ববর্তী দেশসমূহে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। সাম্প্রতিককালে নির্মিত বঙ্গবন্ধু (যমুনা বহুমুখী) সেতু (যা দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘতম) শুধু বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগকেই সুগম করে নি বরং এটি বাংলাদেশকে সমগ্র এশিয়া মহাদেশের সাথেও স্থলপথে সংযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৬) কুটির শিল্পের উপর প্রভাব: কুটির শিল্পের উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট। যেসব অঞ্চলে যে ধরনের কাঁচামাল বেশি উৎপন্ন হয় কিংবা সহজলভ্য সেসব অঞ্চলে ঐ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে কুটির শিল্প গড়ে উঠে । যেমন: রাজশাহীতে প্রচুর তুঁতগাছ জন্মানোর কারণে সেখানে রেশমী শাড়ীর জন্য বস্ত্রমিল গড়ে উঠেছে, তেমনি সিলেট বেত শিল্পের জন্য এবং পাবনা তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭) পোষাক পরিচ্ছদের উপর প্রভাব: পোশাক পরিচ্ছদও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা কাপড় বা গরম পশমী এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ হালকা সূতির কাপড় ব্যবহার করে ।

৮) ঘরবাড়ির উপর প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ঘর বাড়ি তৈরির নমুনা নির্ভর করে। বাড়ি ঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। যেমন-বাঁশ, কাঠ , ছন, খড়, ইট ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদনের প্রভাবধীন। যে অঞ্চলে ভূমিকম্প বেশি হয় সেখানে কাঠের দ্বারা বাড়ি ঘর তৈরি করে ,আবার তুষার অঞ্চলের লোকেরা অর্থাৎ এস্কিমোরা তুষার ঘর তৈরি করে।

৯) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব: শিল্প, সাহিত্য ও প্রযুক্তির সৃষ্টির পেছনেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন: জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার প্রকৃতির কথা ফুটে উঠেছে। তিনি প্রাকৃতির সৌন্দর্য্যের কারণেই বাংলাদেশকে 'রূপসী' বাংলা কলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলের গানের সুর ভাটিয়ালী সুর থেকে আলাদা। ভৌগোলিক পরিবেশ-নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থাই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের রূপরেখা রচনা করে।

১০) আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রভাব: সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের সমাজে যে সকল আচার- অনুষ্ঠান মেনে চলা হয় সেসব ইউরোপের দেশগুলোর আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে ভিন্ন। এক বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে বাঙালি সমাজে আড্ডা, দুপুরে ঘুমান, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং শীতের পিঠা উৎসব এক একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

বিয়ের সময় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান এবং অতিথি আপ্যায়ন পান-সুপারীর ব্যবস্থার অস্ট্রিক জাতিভুক্ত বাঙালির অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য , যার পিছনে অনুকূল ভৌগোলিক উপাদান ক্রিয়াশীল।

১১) ব্যক্তিগত আচরণ ও দক্ষতার উপর প্রভাব: জলবায়ু ও তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে মানুষের আচরণেও ভিন্নতা দেখা যায়। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের মানুষ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধা বেশি লাগে, মেজাজী হয় এবং ঐ অঞ্চলের মানুষের ঘুমের মাত্রা অত্যাধিক। অন্যদিকে, শীত প্রধান অঞ্চলে মানুষের ঘুম কম হয় এবং তারা বেশি পরিশ্রমী হয়।

১২) ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করে। এই কারণেই জাতীয় চরিত্র বলে একটি কথা চালু রয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, এক এক দেশের মানুষের মৌলিক ব্যক্তিত্ব এক এক ধরনের। যেমন: বাংলাদেশের মানুষ বেশি আবেগ প্রবণ, সমতল ভূমির মানুষ ধীর ও শান্ত হয় এবং পাহাড়ী মানুষ হয় কর্মঠ এবং হিংস্র, সমুদ্র এবং নদীপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা সাহসী হয়। কারণ তারা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হয়ে থাকে।

১৩) বনায়ন ও বন উজাড়করণ: বর্তমান পৃথিবীতে বনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং তা আবহাওয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর সর্বত্র বনভূমির পরিমাণ কমে যাওয়ার পেছনে গরীবদেরকে দায়ী করা হলেও ধনীরা কোন অংশে কম দায়ী নয়। গরীব মানুষেরা টিকে থাকার প্রয়োজনে বন থেকে গাছ পালা কেটে ফেলছে। বিখ্যাত আমাজন ফরেষ্ট এর সীমানা ছোট হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ম্যাগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবনকেও আমরা রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এগুলো আঞ্চলিক আবহাওয়াতে বিরূপ প্রভাব তৈরি করছে। বনায়নের চেষ্টা কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হলেও বনধ্বংস করা হচ্ছে।

১৪) বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন: জলবায়ু পরিবর্তন হলো আবহাওয়ার সেসব উপাদান রয়েছে সেসব উপাদানের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া। যেমন: বন্যা, জলোচ্ছাস। অতিবৃষ্টি আগেও হতো কিন্তু বর্তমান সময়ের যত এত বেশি এবং ক্রমশ তীব্রতর অবস্থায় ছিলো না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই এমন হয়েছে। শিল্প কারখানা ব্যাপক বিস্তৃতি এবং প্রযুক্তির ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে বিশ্বের তাপমাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছে এবং ক্রমই বায়ুমন্ডল উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে। এর ফলে মেরু এলাকার বরফ ধীরে ধীরে গলছে যার পরিণতি হিসেবে আমরা দেখি উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে এবং ঘন ঘন বন্যা, উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি তীব্রতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে চলেছে।

পরোক্ষ প্রভাব

১) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব: রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মন্টেস্কু বলেন যে, পৃথিবীর কৃষি প্রধান অঞ্চলে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, আর বাণিজ্যপ্রধান এলাকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে কারণে ইউরোপের শীত প্রধান অঞ্চলের শহরগুলোকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছে ।

২) অপরাধ প্রবণতার উপর প্রভাব: অনেকে মনে করেন যে অপরাধ প্রবণতার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব কম বেশি দায়ী। অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ প্রবণতা, যেমন: খুন, জখম, চুরিসহ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চলে বেশি। কারণ অপরাধ করে সহজেই পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা যায়। বাংলাদেশে জুন ও ডিসেম্বর মাসে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়, কারণ জুন মাসে বাংলাদেশের চাষীরা পাট বিক্রি করে এবং হাতে নগদ টাকা আসে। অন্যদিকে, ডিসেম্বর মাসের লম্বা রাত সিদেল চুরির জন্য ধুবই উপযোগী।

৩) জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব: মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা কম বয়সে বয়োপ্রাপ্তঃ হয় আর শীত প্রধান দেশের লোকেরা বেশি বয়সে বয়োপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে জন্মহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৪) নীতিবোধের উপর প্রভাব: মানুষের নীতিবোধের উপরও ভৌগোলিক প্রভাব দেখা যায়। গো-রক্ষা ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মের একটি অন্যতম অংশ। তাই সে সমাজে গো-হত্যা মহাপাপ বলে গণ্য। প্রাচীনকালে যখন ভারতে কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে তখন কৃষি উৎপাদনের জন্য গরুর প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। আবার মরু অঞ্চলে অতিথি পরায়ণতা একটি বিশেষ নীতিধর্ম। মরু অঞ্চলে প্রচন্ড গরমে যাতায়াতের সময় ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হয়। তাই সেখানকার মানুষের

মধ্যে গড়ে উঠেছে অপূর্ব আতিথেয়তাবোধ। আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশজনিত কারণে আরবের সংস্কৃতিতে আতিথেয়তা একটি নীতিবোধ হিসেবে আখ্যায়িত।

৫) সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা: ভৌগোলিক কারণে যেসব অঞ্চলে দুর্যোগ বেশি হয় সেখানকার সামাজিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

পরিশেষে বলা যায় সমাজ ব্যবস্থা , মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচার- অনুষ্ঠানে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান। তাই মানুষের জীবনে যে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে তা অনস্বীকার্য। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় নি। ভৌগোলিক পরিবেশ এখনও মানুষের সমগ্র জীবন ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। আর মানুষ তার ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংহতি রক্ষা করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে চলেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজ জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক উপাদানের বৈচিত্র্যের কারণেই পৃথিবীর নানান দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি পরিলিক্ষিত হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা চেতনা, পরিকল্পনা, কাজকর্ম ও আচার আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে মানুষ কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব ও পরোক্ষ প্রভাব। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। ভৌগোলিক পরিবেশ এখনও মানুষের সমগ্র জীবন ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানব জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

(ক) দুই ভাগে (খ) তিন ভাগে

(গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

বহুনির্বাচনী :

২। কোনটি পরোক্ষ প্রভাবের সাথে জড়িত ?

(i) নীতিবোধ

(ii) শিল্প

(iii) অপরাধ প্রবনতা

(ক) i (খ) i + ii (গ) ii + iii (ঘ) i + iii ।

পাঠ-৬.২ সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
Impact of Culture on Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবেশ, সংস্কৃতি, সমাজ, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট চ্যানেল, প্রভাব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে, 'মানব সৃষ্ট সব কিছুই সংস্কৃতি'। অর্থাৎ মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তাই সংস্কৃতি। ব্যাপক অর্থে মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন, ভাষা এবং মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এমন কি বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে সকল কৌশল অবলম্বন করে সে সব কিছুর সমষ্টি হল সংস্কৃতি। মানুষ ও মানুষের সমাজ এই সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়।

মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ তার সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির জীবনে এই সংস্কৃতির প্রভাব কখনো অবচেতন, আবার কখনো সচেতন ভাবে কাজ করে। ব্যক্তি তাই সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সাংস্কৃতিক উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজজীবনকে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তার মধ্যে সংস্কৃতি অন্যতম।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মানব-সৃষ্ট সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণকে বুঝিয়ে থাকেন। মানব সংস্কৃতির দুটি দিক আছে ক) পার্থিব (Material) এবং খ) অপার্থিব (Non material)। তবে সংস্কৃতি বলতে সাধারণ সমাজের সুকুমার শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অবদানকে বোঝানো হয়ে থাকে।" অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা প্রভৃতি সূক্ষ শিল্প কর্মকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা যে অর্থে সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন তা সংস্কৃতির প্রচলিত সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্নতর। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি হল মানুষের চিন্তা ও কর্মের একটা সার্বিক রূপ। মানুষের জীবনে পরিপূর্ণ প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি। মানুষের সমাজজীবনকে যে চারটি মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে তার মধ্যে সংস্কৃতি অন্যতম। সংস্কৃতি সব সময়ই সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে।

প্রথমেই আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যা তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একজন মানুষ প্রথমত তার পরিবারের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে মানুষের উপর তার সমাজের প্রভাব পড়ে। একথা আমরা সকলেই জানি যে, একটি সমাজের সংস্কৃতিতে যেসব বিষয় শালীনতাপূর্ণ আচরণ বলে গণ্য সেই একই আচরণ অন্য সমাজের সংস্কৃতিতে নিন্দিত হতে পারে। যেমন: বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়া পাশ্চাত্য সমাজে এমন কিছু গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয় না। কিন্তু গুরুজনের সামনে সিগারেট খাওয়া আমাদের সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এভাবেই সংস্কৃতি প্রতিনিয়তই মানুষের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক মানুষেই একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের মাঝে জন্মগ্রহণ করে। ম্যাকাইভার বলেন, "মানুষ কখনো কখনো সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতিই মানুষকে প্রভাবিত করে।" এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কোনো মানব শিশু যদি মানব সমাজের সংস্কৃতি বহির্ভূত পরিবেশে বড় হয়, তাহলে তার আচার আচারণ মানুষের মত না হওয়াই স্বাভাবিক।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সমাজজীবন

বর্তমানে আমরা তথ্যের এক দারুন যুগে বাস করি। একবিংশ শতকের প্রথমাংশে তারবিহীন প্রযুক্তিগত যোগাযোগের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তীব্র গতি এনে দিয়েছে। এই প্রযুক্তি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছে যে, আমরা এখন সহজেই বলতে পারি যে, বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ এখন ইন্টারনেটের কল্যাণেই পরস্পর যুক্ত হবার এ অভিনব সুযোগ পেয়েছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত আমাদের সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ বোঝাতে প্রায়ই 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্ক সোসাইটি বলতে বোঝায় এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষজন সবাই প্রযুক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভ্যস্ত এবং পারস্পরিক সার্বক্ষণিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে আমাদের দেশেও এর একটা বড় প্রভাব পড়েছে। গত এক দশকে যে পরিমাণে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে তা বিগত দশকে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। অফিস আদালত থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের বাজার, পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত অনেক কিছুই এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট নির্ভর। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্এ্যাপ, ইউটিউব এসবের নাম জানেনা এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শুধু তাই নয় ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখন গ্রামীণ সমাজেও পরিবর্তন আনছে উল্লেখযোগ্য গতিতে।

সমাজের সদস্যদের আচার-আচারণে, নৈতিকতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে, মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। আধুনিক স্যাটেলাইট ভিত্তিক আকাশ সংস্কৃতির যুগে নানান দেশের সংস্কৃতিগত ধারণা মানুষ গ্রহণ ও চর্চা করছে। বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির এ বৈশ্বিক প্রবণতা থেকে বাদ পড়ে নি। স্যাটেলাইট কেন্দ্রিক এই যে সংস্কৃতির সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা-একে বলা হয় সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন।

টেলিভিশনের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং শত শত স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে বাংলাদেশে বসেই আমরা বিশ্বের নানান দেশের টিভি চ্যানেল উপভোগ করার সুযোগ পাই। এসব থেকে ঐসব দেশের ভাষা, আচরণ, মনোভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাপন তথা সামগ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে থাকি, কখনো সজ্ঞানে কখনো বা অজান্তেই। এসব থেকে যেগুলো আমাদের কাছে উপভোগ্য মনে হয়, সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করি। সেসব সংস্কৃতির কোনো বিশেষ উপাদান আমাদের জীবনযাত্রাকে আরো সহজতর ও উপভোগ্য করবে বলে যদি আমরা মনে করি তবে আমরাও ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিটি সেন্টার কেন্দ্রিক বিয়ে ব্যবস্থা বাঙালি সংস্কৃতিতে কখনোই ছিল না। অন্য সংস্কৃতির এই ধারণা আমাদের কাছে (বিশেষত নগর সমাজ ব্যবস্থায়) সহজতর মনে হওয়ায় আমরা একে গ্রহণ করেছি। এভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভাষা, পোষাক, আচরণ, ভাবনার ধরণ, যোগাযোগের ব্যাপ্তি, উৎসব উৎযাপনের ধরণ ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা উপাদান নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত তারুণ্য এসব ভিন্ন সংস্কৃতিকে পছন্দ করে বেশি, এর মূল কারণ হলো বয়সের কৌতুহল। তবে সময়ের ব্যবধানে সব বয়সের মানুষেরাই স্যাটেলাইট সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চলছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে এই যে সংস্কৃতির পরিবর্তন তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাবই রয়েছে। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রায় গতি এসেছে, আমাদের উৎসবের উদযাপন এখন অনেক বৈচিত্র্যময়। অন্যদিকে, নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে অপরাধের বিস্তার, অপরাধের ধরণে নানামুখী জটিল প্রযুক্তির ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে নানামুখী সন্দেহ ও জটিলতার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজ জীবনে স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষের সমাজজীবনকে যে চারটি মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে তার মধ্যে সংস্কৃতি অন্যতম। সংস্কৃতি সবসময়ই সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যা তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একজন মানুষ প্রথমত তার পরিবারের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে মানুষের উপর তার সমাজের প্রভাব পড়ে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত আমাদের সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ বোঝাতে প্রায়ই 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্ক সোসাইটি বলতে বোঝায় এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষজন প্রযুক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভ্যস্ত এবং পারস্পরিক সার্বক্ষণিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখন গ্রামীণ সমাজেও পরিবর্তন আনছে। টেলিভিশনের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং শতশত স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে বাংলাদেশে বসেই আমরা বিশ্বের নানান দেশের টিভি চ্যানেল উপভোগ করার সুযোগ পাই। এভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভাষা, পোষাক, আচরণ, ভাবনার ধরণ, যোগাযোগের ব্যাপ্তি, উৎসব উদযাপনের ধরণ ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা উপাদান নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংস্কৃতির দিক কয়টি ?

(ক) তিনটি (খ) দুইটি

(গ) পাঁচটি (ঘ) চারটি

২। 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' প্রত্যয়টি যুক্ত হয়েছে কিসের মাধ্যমে ?

(ক) স্যাটেলাইট চ্যানেল (খ) ফেসবুক

(গ) ইন্টারনেট (ঘ) ইউটিউব

পাঠ-৬.৩ সমাজজীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব
Impact of Group on Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও ধরন বলতে পারবেন;
- সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক গোষ্ঠী, সমাজ, আন্তরিকতা, মুখ্য ও গৌণ দল, ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

মানুষ সহজাতভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে। এ কারণে সমাজে বসবাসের সময় মানুষ ছোট বড় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার সামাজিক জীবনকে উপভোগ করে। মানুষ একই সাথে একাধিক দল বা গোষ্ঠীর সাথে তার সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে। এসব সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

সামাজিক দল হলো দুই এর অধিক যে কোনো সংখ্যক মানুষের সমন্বয়ে সৃষ্ট গোষ্ঠী যারা কোনো না কোনো কারণে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। দলের আকার খুব ছোট বা অনেক বড় হতে পারে। মাত্র দুজন থেকে একটা দেশের সমগ্র জনসংখ্যা পর্যন্ত একটি দল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

সামাজিক দলের অন্যতম একটি শ্রেণিকরণ করেছিলেন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী সি. এইচ কুলি। তাঁর মতে, সামাজিক দল বা গোষ্ঠী দু রকম-প্রাথমিক বা মুখ্য দল এবং গৌণ দল।

কুলির মতে, প্রাথমিক বা মুখ্যদলের সদস্যদের মধ্যে খুব আন্তরিকতা বিরাজ করে। তাদের মধ্যে দৈনন্দিন আন্ত:সম্পর্ক ঘটে থাকে। সদস্যদের মধ্যে একটা নিজস্ব ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক বিরাজ করে যা দীর্ঘ সময় অবধি ভালভাবে টিকে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে আবেগী সম্পর্ক বজায় রাখে। অর্থ্যাৎ এই দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ ও আন্তরিকতা উভয়ই দারুণভাবে কাজ করে। উদাহরণসরূপ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ ধরণের সম্পর্ক কাজ করে বিধায় তা মুখ্য দল।

পক্ষান্তরে গৌণ দল এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের মধ্যে আন্তরিকতা সামান্যই থাকে। এদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ প্রায় থাকে না বললেই চলে। গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক হলো কাজ ভিত্তিক বা কাজের সম্পর্ক। তাদের মধ্যে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। যেমন: হাই স্কুল পাসের পর কেউ যখন কোনো দোকানে চাকরি নেয় তখন দোকানের বাকি কর্মীদের সাথে ব্যক্তির কাজের সম্পর্কই থাকে, অন্য কিছু নয়।

সমাজজীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব

সমাজবিজ্ঞানে মুখ্য ও গৌণ দলের পাশাপাশি আরো একটা দল গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। এটি হলো রেফারেন্স দল। একজন ব্যক্তি বা একটি দলকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে অন্য যে একটি দলের উল্লেখ করে তুলনা করা হয় সেই 'অন্য' দলটিই হলো রেফারেন্স দল। রেফারেন্স দলের উল্লেখ করাই হয় মূলত একটি দলের গুণগত বৈশিষ্ট্য তুলনা করার জন্য। এতে দলের গুণগত ঘাটতি হলো নাকি অগ্রগতি হলো তা ভালভাবে বোঝা যায়। এতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার কাজে প্রেরণা পায় এবং অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।

ব্যক্তির সামাজিক জীবনে যে সকল দল বা গোষ্ঠীর প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় থাকে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিক জীবন আবর্তিত হয় সেগুলোকে এখানে তুলে ধরা হলো–

১) পরিবার

সামাজিক উপাদানের মধ্যে পরিবারই প্রধান। মানব শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। পরিবারে পিতামাতাই হয় শিশুর প্রথম সাথী, বন্ধু এবং প্রতিপালক তাই পিতামাতার আচরণ ব্যবহার তথা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে।

শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায়ে পরিবারই হচ্ছে একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবারই ব্যক্তির অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন। পরিবারই স্নেহ-ভালবাসা, প্রথা, আচার-ব্যবহার এবং নিয়ম-শাসনের মধ্য দিয়ে একটি শিশুর জীবন পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়। তাই বলা হয় পরিবারই শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির, সমাজের প্রতি ব্যক্তির, প্রতিবেশির প্রতি ব্যক্তির আচার ব্যবহার কী হবে, তার শিক্ষা জীবন, তার সামাজিক জীবন কীভাবে গড়ে উঠবে এসব কিছুর জ্ঞান সে প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকেই আয়ত্ত করে। বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব কী হবে তাও সে পরিবার থেকেই অর্জন করে। সর্বোপরি একজন মানুষের সার্বিক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক গুণাবলি পারিবারিক পরিবেশে বিকশিত হয়। পারিবারিক কাঠামো বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন:যৌথ পরিবার ও একক পরিবার। আবার ধনসম্পদ, শিক্ষা ও পেশার ভিত্তিতে আমরা পরিবারকে শিক্ষিত পরিবার, ধনী পরিবার, মধ্যবিত্ত পরিবার, গরীব পরিবার, ব্যবসায়ী পরিবার, কৃষক পরিবার, শ্রমিক পরিবার প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। যে ধরনের পরিবারই হোক না কেনো সংশ্লিষ্ট পরিবারে শিশুরা সেভাবেই গড়ে উঠবে। পরিবার ব্যক্তির উপর সামাজিকীকরণ ধরে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি যদি ধর্মীয় মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারে।

২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সমাজবিজ্ঞানে ধর্মকে একটি প্রতিষ্ঠান বল হয় মানব সমাজের প্রত্যেকটি ধর্ম সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। মসজিদ, মন্দির ও চার্চ যথাক্রমে মুসলিম, হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজের লোকদের আচার আচরণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রভাবিত করে। এটি দলগত তথা সামাজিক প্রভাবেরই নামান্তর। আর এভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের আচরণ ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জীবনকে সুন্দর ও মার্জিত করতে পারে। মানব শিশু তার পরিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে শুরু হয়। এখানে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে পরিচিত হয়। এ ফলে তার মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি বিদ্যালয়ের শুধু পুঁথিগত জ্ঞানই অর্জন করে না। বিদ্যালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড তথা সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদন মূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সে একজন পরিপূর্ণ সামাজিক ব্যক্তিরূপে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। পারিবারিক গন্ডি পার হয়ে মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দলগত জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এখানে সে বিভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ থেকে আসা ছাত্র- ছাত্রীদের সাথে মিশে এবং ভাল মন্দ সম্পর্কে অবহিত হয়। সে জন্য স্কুল জীবনকে বলা হয় ব্যক্তির ভবিষৎ জীবনের সূতিকাগার। এতএব আমরা বলতে পারি ব্যক্তির সমাজজীবন রূপায়ণে বিদ্যালয় হলো সূতিকাগার ।

৪) খেলার সাথী

মানব শিশু যখন বড় হয় তখন সে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলায় অভ্যস্ত হয়। পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে একটি শিশু খেলার মাঠে পাড়া প্রতিবেশি ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিশুর সংস্পর্শে আসে। খেলার সাথীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান শুরু হয়। খেলার মাঠে সে পরিবারের বাইরে জগতের অস্তিত্ব অনুভব করে। খেলার মাঠ থেকে সে নেতৃত্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। খেলাধূলার নেতৃত্বদান ও নিয়ম-শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিকতার বিকাশ ঘটে।

খেলার সাথীদের সঙ্গ এমনই একটি সামাজিক উপাদান যার থেকে মানুষ তার জীবন গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জন করতে পারে। খেলার মাঠ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও বিভিন্ন গুণাবলি তার ভবিষৎ জীবনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে। অতএব বলা যায় একজন ব্যক্তির সামাজিক জীবন রূপায়নে ও তার সমাজজীবনের গন্ডি বৃদ্ধিতে খেলার মাঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৫) সংঘ

মানুষ যখন পারিবারিক গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার সামাজিত পরিধি বৃদ্ধি পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে তার জ্ঞানের প্রসার ঘটে। সমাজ সম্পর্কে তার আগ্রহ বেড়ে যায় এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করার স্পৃহা বিকশিত হয়। কোনো না কোনো সংঘের সদস্য হলেই মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। সংঘ হচ্ছে ঐচ্ছিক সংগঠন। সেখানে মানুষ অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংগঠিত হয়। সংঘ বলতে তাই সমভাবাপন্ন কতক ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বকীয়তা ও সৃজনশীলকার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়। সেজন্য মানুষ খেলাধূলা, সংগীত র্চচা, চিত্তবিনোদন ও সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। সংঘের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে দেশের ও জনসেবার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমেই মানুষ সামাজিকতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। মানুষ নেতৃত্ব প্রদান একং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেও শিখে। অর্থাৎ সংঘ হচ্ছে মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম সামাজিক উপাদান।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দল এবং সংষ মানুষ ও তার সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। এছাড়া আরো কতগুলো উপাদান আছে যেসব মানুষের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে যেমন: বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কর্মক্ষেত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও পত্রপত্রিকা প্রভৃতি। মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারে না। যে বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে। সামাজিক মেলামেশার মধ্যদিয়ে সে কতকগুলে গুণ আয়ত্ব করে। সে ভাল বন্ধুর সহযোগিতায় জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়, আর মন্দ লোকের সাহচর্যে অনেকের জীবন ধ্বংস হয় । আত্মীয়স্বজনের প্রভাবও মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ যখন পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গন্ডি পার হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানেও সে বিভিন্ন সহকর্মীর ও পেশাজীবী মানুষের সংস্পর্শে আসে। এর ফলে তার আচরণ ও ভাবধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজজীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উপাদানসমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত, কোনোটির প্রভাবকেই খাটো করে দেখা যায় না। প্রত্যেকটি উপাদান স্ব স্ব পরিমন্ডলে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এসব কিছুর সমন্বয়েই ব্যক্তি জীবন আবর্তিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষ একই সাথে একাধিক দল বা গোষ্ঠীর সাথে তার সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে। এসব সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির সামাজিক জীবনে যে সকল দল বা গোষ্ঠীর প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় থাকে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিক জীবন আবর্তিত হয় সেগুলো হলো পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী ও সংঘ। সমাজজীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ , বংশগতি , সংস্কৃতি এবং সামাজিক উপাদানসমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি উপাদান স্ব স্ব পরিমন্ডলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি.এইচ কুলি কোন দেশের সমাজ বিজ্ঞানী ?

(ক) জার্মান (খ) ইটালি

(গ) ফ্রান্স (ঘ) আমেরিকান

উদ্দীপকের আলোকে ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

শান্তিপুর একটি গ্রামের নাম। সেখানকার লোকজন সব সময় নিজের কাজে আন্তরিকতা নেই বললেই চলে। তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক কাজ ভিত্তিক। ঐ গ্রামের লোকজন দেখা সাক্ষাত ঠিবন্তত হয় না, আবেগ নেই বললেই চলে।

২। উপরোক্ত উদ্দীপক কোন ধরনের দলের বৈশিষ্ঠ্য পাওয়া যায় ?

(i) মুখ্য দল

(ii) গৌন দল

(iii) রেফারেন্স দল

(ক) i (খ) iii (গ) i + ii+ iii (ঘ) কোনটিই নয়

৩। সমাজ জীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব অধিক কার্যকরী বলে কোনটি বিবেচিত ?

(ক) পরিবার (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

(গ) সংঘ (ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পাঠ-৬.৪ সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব
Impact of Heredity on Social Life

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বংশগতির ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বংশগতি, সমাজ, বংশ পরম্পরা, অঞ্চল, ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ইত্যাদি।

পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র। কোনো মানুষই চিন্তা ভাবনা, আচরণগত বৈশিষ্ট্য কিংবা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে কখনোই পুরোপুরি আরেকজন মানুষের মত হয় না। এমনকি যেসব বাচ্চা জমজ হিসেবে জন্মায় তাদের চিন্তাধারায়ও ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত আমরা যখন মানসিক চিন্তার বিষয়কে তুলনা করার চেষ্টা করি তখনই সবচাইতে বেশি ভিন্নতা দেখা যায় । জীবের অনেক বৈশিষ্ট্যই তার ক্রমোজমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। এ কারণে অনেক সময়ে সন্তানের সাথে পিতামাতার কিংবা তার পূর্বসূরীর দৈহিক, আচরণগত এমনকি মনোগত বৈশিষ্ট্যেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এ বির্তক Nature versus nurture বা Heredity versus environment নামে পরিচিত। উত্তরাধিকার বা বংশগতি সম্পর্কে উপরে যা বলা হয়েছে এর বিপরীতে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আছেন যারা মনে করেন মানুষের সামাজিক জীবন বংশগতির চেয়ে বরং পরিবেশ দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। বংশগতি তথা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যত বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে তার পরিপার্শ্বস্থ ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে সেসব বৈশিষ্ট্য বিকশিত কিংবা অদমিত হয়। তবে একটা বিষয় নিয়ে প্রায়শই দ্বিমত থাকে না যে ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বংশগতির পারস্পরিক প্রভাবেই সমাজস্থ মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই তার জীবন অতিবাহিত করে থাকে।

সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। বংশগতি বলতে সাধারণত কতকগুলো জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যেসব জন্মসূত্রে মানুষ লাভ করে। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি, মেজাজ সর্বোপরি দৈহিক কাঠামো একান্তভাবেই বংশগতির প্রভাবাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় এসব উপাদান সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তন করতে পারেনা। মানুষের গড়া সমাজের উপর বংশগতির একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জন্মসূত্রে মানুষ মা-বাবা ও দাদা দাদির কাছ থেকে দেহের আকৃতি, চোখের আকৃতি, রং ইত্যাদি অবয়ব পেয়ে থাকে। দেহের রং, চুলের রং, মাথার আকৃতি, রক্তের গ্রুপ, মন-মেজাজ, ও রোগ-ব্যাধির অনেকটাই মানুষ বংশানুক্রমিক ধারায় অর্জন করে। জীববিজ্ঞানী মেন্ডেল বংশগতির এ তত্ত্ব দিয়েছেন বলে একে মেন্ডেলবাদ বলা হয়। বংশ পরম্পর জৈবিক বৈশিষ্ট্যাবলির পুনরাবৃত্তির মধ্যেই মেন্ডেলবাদের মূল কথা নিহিত।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর সমাজ দর্শনে সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাথে মানসিক গুণাবলির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ঐ মানসিক গুণাবলির অনেকটাই জৈবিক বৈশিষ্ট্য থেকে অর্জিত। প্লেটো তাঁর 'দি রিপাবলিক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানসিক গুণাবলির ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন। যেমন: তিনি যুক্তি (Logic), সাহস (Courage) ও ক্ষুধা (Appetite)- এ তিনটি জৈব মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রীক সমাজে যথাক্রমে দার্শনিক তথা শাসক শ্রেণি, যোদ্ধা শ্রেণি ও উৎপাদক শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে প্লেটোর চেয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্র এরিষ্টটলের রচনায় (পলিটিকস) বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণি যথা দাস ও দাস-মালিক শ্রেণির অস্তিত্বে মূলে যে জৈবিক উপাদান তথা বংশগতি অধিকতর ক্রিয়াশীল সে কথা

অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এরিষ্টটলের মতে, দাস প্রভু সমাজে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দাস ছাড়া প্রভু কিংবা প্রভু ছাড়া দাসের কল্পনাই করা যায় না। বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে, কেবল উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর লোকেরাই সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কারণ তারা সভ্য, মার্জিত, কর্মঠ, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা ও সভ্যতার ধারক ও বাহক । তারা উৎকৃষ্ট শাসকও বটে।

অপর পক্ষে, নিকৃষ্ট বংশধারার লোকেরা অলস ও অমার্জিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের অনীহা থাকে। তাই তারা সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে কোন অবদানই রাখতে পারে না। বর্ণবাদী পন্ডিত তথা জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদীদের মতে, উৎকৃষ্ট জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষেরাই কেবল সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণাবলির অভাব ঘটলে সভ্যতার পতন ঘটে।

তাঁদের মতে, উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য লোপ পাবে এবং উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী সভ্যতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে ব্যর্থ হবে। এতে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীও বংশগতির প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। এরা বিশ্বাস করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক জন্মগতভাবেই উত্তম অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তায় এরা উন্নত। এরা কর্মবীর, এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসক ও নেতা পদে আসীন হতে পারে। সে যা হোক বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞনীদের উক্ত ধারণা আজকাল ভ্রান্ত বলে আর স্বীকৃতি পায় না । অর্থাৎ মানুষের জীবনে বংশগতির চেয়ে পরিবারের প্রভাব বেশি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্সিস গ্যাল্টন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যে কোনো পরিবারেই উত্তম ও অনন্য প্রতিভা জন্মাতে পারে। তাঁর মতে, পিতা মাতা যদি বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত মানের হয় তা হলে তাদের সন্তানরাও উন্নত মানের এবং প্রতিভাবান হতে পারে। এই প্রতিভাবান সন্তানরা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। তবে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

বিজ্ঞানী গোবীনের মতে, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির মূলে নরবংশগত উপাদানই দায়ী। তাঁর মতে, উৎকৃষ্ট নরবংশ যদি বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে না। অপরপক্ষে, নিকৃষ্ট নরবংশের লোক যতই পরিশ্রমী হোক না কেনো তাদের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতার কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়।
লাপোজের মতে, নরবংশ যদি নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয় তবে শিক্ষা কিংবা অনুকূল পরিবেশ তার মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। জন্মগতভাবে নির্বোধ ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা যায় না।
কার্ল পিয়ার্সনের মতে, দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তারাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়। তাঁর মতে, মানব জাতির উত্থান ও পতনের জন্য মূলত জৈবিক উপাদানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন বলেন যে, একই সমাজের মধ্যে জন্মসূত্রে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাঁর মতে, উচ্চ শ্রেণির লোকদের সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) নিম্ন শ্রেণির লোকদের সন্তানদের সমান সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে লালন পালন পরও দেখা গেছে যে, নিম্ন শ্রেণির লোকদের সন্তানেরা সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। অথচ উচ্চ শ্রেণির ছেলেমেয়েরা সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পরিবেশ এক হওয়া সত্ত্বেও বংশগতির পার্থক্যের কারণে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তারা সমান অবদান রাখতে পারছে না।

অপরাধ বিজ্ঞানীরাও বংশগতির প্রভাবকে সমাজে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী করেন। এঁদের মধ্যে লম্ব্রোসো অন্যতম। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডোগাল তাঁর তত্ত্বে বংশগতির প্রভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মানুষের কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, যেসব মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে এবং সে যে আচরণ করে তা এই সহজাত প্রকৃত্তিরই ফল।
তবে বংশানুক্রমের উপর পরিবেশের প্রভাবকে বৈজ্ঞানিকরা একেবারে অস্বীকার করেন নি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ, অনুকূল জলবায়ু, খাদ্য এবং শিক্ষার কোনো ভূমিকা নেই একথা স্বীকার করেন না। ভৌগোলিক পরিবেশ কিভাবে সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে এই বিষয়টি ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত পাঠের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি।

অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশ ও বংশগতি উভয়েরই কম বেশি প্রভাব রয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিসত্ত্বা গড়ে

উঠে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি ও পরিবেশ মানুষের জীবনের উপর বহুমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে, বংশগতির প্রভাব অনেকটা গৌণ বলে প্রতীয়মান হয়।

তাই বলা যায় যে, ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ কোনোটাই উপেক্ষণীয় নয়। মানুষ তার আচরণ ব্যবহার চলাফেরা ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং অনুকূল পরিবেশের সহায়তায় ঘটাতে পারে। পরিবেশ অনুকূল হলে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত হবার সুযোগ বেশি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

উত্তরাধিকার বা বংশগতি সম্পর্কে অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন মানুষের সামাজিক জীবন বংশগতির চেয়ে বরং পরিবেশ দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। বংশগতি তথা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যত বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে তার পরিপার্শ্বস্থ ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে সেসব বৈশিষ্ট্য বিকশিত কিংবা অদমিত হয়। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বংশগতির পারস্পরিক প্রভাবেই সমাজস্থ মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই তার জীবন নির্বাহ করে থাকে। বংশগতি বলতে সাধারণত কতকগুলো জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যেসব জন্মসূত্রে মানুষ লাভ করে। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা , স্মরণশক্তি, মেজাজ সর্বোপরি দৈহিক কাঠামো একান্তভাবেই বংশগতির প্রভাবাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় এসব উপাদান সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তন করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ‘দি রিপাবলিক’ গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

(ক) সক্রেটিস (খ) প্লেটো

(গ) এরিস্টটল (ঘ) রুশো।

২। ‘দৈহিক ও মানস্তাতিক বৈশিষ্ঠ্য উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়’ উক্তিটি কার ?

(ক) সরোকিন (খ) লোপজের

(গ) পিয়ার্সনের (ঘ) ম্যাকডোনাল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। কোনটি ঐচ্ছিক সদস্যপদের বিষয়?

(ক) পরিবার খ) সম্প্রদায়

(গ) সংঘ (ঘ) সবগুলোই

২। 'দি রিপাবলিক গ্রন্থের' রচয়িতা কে?

(ক) প্লেটো (খ) এরিস্টটল

(গ) সক্রেটিস (ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। কুলি-এর মতে প্রাথমিক বা মুখ্যদলের মধ্যে কাজ করে-

(i) ভালবাসা

(ii) আবেগ

(iii) অনুভূতি

(iv) আন্তরিকতা

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) সবগুলোই (ঘ) ii ও iv

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

স্নাতক পড়ুয়া রাকিব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত। তার আচরণ মার্জিত, সে পড়াশোনাতেও খুব ভাল। একদিন শিক্ষক রাকিবদের ক্লাসে সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষক বলেন- ভাষা, আচরণ, মনোভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি স্যাটেলাইট চ্যানেল দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পরিবর্তিতও হয়। এর ফলে আমরা আমাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলি। রাকিব তার শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে একমত নয়। তার মতে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আমরা বিভিন্ন দেশের ভাষা, পোষাক, আচার-আচরণ, কৃষ্টি, যোগাযোগ, জীবনযাত্রার মান ও সুযোগ সুবিধাসহ নানান বিষয় জানতে পারি।

১) সংস্কৃতি কী? ১

২) 'সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন' বলতে কী বোঝায়? ২

৩) উদ্দীপক অনুযায়ী রাকিবের মতামত কোন ধরনের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে বলে আপনি মনে করেন? ৩

৪) উদ্দীপকের রাকিব ও তার শিক্ষকের মতামতের মূল পার্থক্যের জায়গাটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১। খ ২। গ